নবীজির সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্ক

মারিয়াম আমিরএব্রাহিমী

অনেককেই আফসোস করতে দেখা যায় যে আমরা আর রাসূল (সা) -এর সাহাবিদের মতো নই; তাদের সময় ও পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। আমরা কখনোই যেন তাদের মতো হতে পারব না। এই ধারণাটি সেসব সময়েই বেশি টেনে আনা হয় যখন মুসলিম যুবক-যুবতীদের সাপেক্ষে নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিষয়টি আলোচনা করা হয়। বলা হয় সেই মহান প্রজন্ম থেকে আজকের প্রজন্ম কতটা দূরে!

কিন্তু যে ধারণাটি আমাদের মধ্যে অধিক প্রচলিত, প্রকৃত সত্য তার বিপরীত। নবীজি (সা)-এর সমাজের তরুণ-তরুণীদেরও তাদের কামনার সঙ্গে লড়তে হয়েছে। তাঁরাও হোঁচট খেয়েছিলেন, তাঁদেরও ভুল হয়েছিল। তাঁদের পরিবেশ-পরিস্থিতির ভেতর দিয়েই নবী (সা) তাঁদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, শিখিয়েছেন আর সাহায্য করেছেন মহৎ মানুষে পরিণত হতে।

তো আসুন আমরা দেখি নবীজি (সা) কীভাবে তাঁর সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্কের বিষয়টি মোকাবিলা করেছিলেন। এতে করে আমরা আজকের দিনে অনুসরণের জন্য সেখান থেকে কিছু শিখতে পারব।

ইবন □আব্বাস (রা) বলেছেন, □সবচেয়ে সুন্দরী নারীদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এক নারী রাসূল (সা)-এর পেছনে নামাজ আদায় করতেন। কিছু কিছু লোক প্রথম কাতারে নামাজ আদায় করতেন যাতে সেই নারীকে তাদের দেখতে না-হয়। অন্যদিকে কিছু লোক পুরুষদের শেষ কাতারে নামাজ আদায় করতেন, আর বগলের নিচ দিয়ে সেই নারীকে দেখতেন। তাদের এই কাজের জন্য আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, □আমি তোমাদের মধ্যে পূর্বে আগমনকারীদেরকেও জানি আর পরে আগমনকারীদেরকেও জানি।□ [সূরা আল-হিজ্‌র, ১৫:২৪] [১]

এই হাদীস থেকে আমরা দেখি যে, নবীজি (সা)-এর শহরে বসবাসকারী এবং তাঁর মাসজিদে নামাজ আদায়কারী কিছু লোকও হোঁচট খেয়েছিলেন, তারা একজন নারীকে দেখতেন। কিন্তু তারপরও রাসূল (সা) এ ব্যাপারে কী করেছিলেন?

তিনি কি নারী ও পুরুষের মধ্যে দেওয়াল তৈরি করেছিলেন? না। নারীরা যাতে পুরুষদের প্ররোচিত করতে না-পারে সেজন্য নারীদেরকে মাসজিদে আসতে বারণ করেছিলেন? কখনো না। বরং তিনি (সা) এর উল্টোটাই করেছিলেন। আল্লাহর ঘরে যাওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের যাতে বাধা দেওয়া না-হয় সেই আদেশই দিয়েছিলেন তিনি। [২]

নারী ও পুরুষ যেন একই সমাজের অংশ হতে পারে, একই সমাজের হয়ে একত্রে কাজ করতে পারে, পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে সেটাই করেছিলেন তিনি। তবে একই সঙ্গে তিনি (সা) তাঁর সমাজকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন যাতে তারা তাদের কামনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

নিচে আমরা এমন কিছু ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরছি যা থেকে আমরা বুঝতে পারব কীভাবে তিনি এ কাজগুলো করেছেন:

১. □আবদুল্লাহ ইব্‌ন □আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, □কুরবানির ঈদের দিনে রাসূল (সা) সঙ্গী হিসেবে তাঁর উটনীর পেছনে উঠেছিলেন আল-ফাদ্‌ল বিন □আব্বাস। সে ছিল খুবই সুদর্শন এক পুরুষ। রাসূল (সা) এক জায়গায় থামলেন মানুষদের বিভিন্ন

প্রশ্নের সমাধান দেবার জন্য। এদিকে খাসাম গোত্রের এক সুন্দরী নারী এল আল্লাহর রাসূল (সা) এর কাছে সিদ্ধান্ত জানতে। সেই নারীর সৌন্দর্য আল-ফাদ্‌লকে এতটাই আকর্ষণ করেছিল যে, সে তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না। আল-ফাদ্‌ল যখন সেই নারীর দিকে তাকিয়ে ছিল, রাসূল (সা) পেছন ফিরে তা দেখলেন। তিনি তার হাত পেছন দিকে বের করে আল-ফাদ্‌লের চিবুক (থুতনি) ধরে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন যাতে সে তাকে আর দেখতে না পারে... [৩]

খেয়াল করে দেখুন রাসূল (সা) আল-ফাদ্‌লকে কীভাবে প্রশিক্ষণ দিলেন যাতে তিনি একজন দায়িত্বশীল পুরুষে পরিণত হতে পারে। সে তার কামনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি দেখে তিনি কিন্তু তাকে কোনো ধমক দেননি। এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, তিনি কিন্তু আল-ফাদ্‌লকে এমন কোনো কথা বলেননি যে, যাতে তার মনে এই বিশ্বাস জাগে যে, সমস্যার গোড়া হচ্ছে ঐ নারীর অস্তিত্ব; আর এখানে আল-ফাদ্‌লের কোনো দায়িত্ব ছিলো না। উল্টো তিনি আলতো করে আল-ফাদ্‌লের মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তাকে শিখিয়েছেন যে তার কাজের জন্য তাকেই দায়িত্ব নিতে হবে।

নারীদের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হবে তাও তিনি উম্মাহর বাকী অংশকে শিক্ষা দিলেন।

সেই নারীকে রাসূল (সা) ফিতনা হওয়ার কারণে কোনো অভিশাপ দেননি। তাকে এজন্য দায়ীও করেননি যে, সে আল-ফাদ্‌লকে প্ররোচিত করেছে। তিনি তাকে দূরেও সরিয়ে দেননি। বরং সে যাতে রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নিতে পারে তার জন্য সেই কাজটিকে সহজ করে দিলেন। আবার একই সঙ্গে কেউ যেন তাকে দেখতে না পারে সে ব্যবস্থাও করে দিলেন।

এখানে আমরা এটাও দেখছি না যে, নবী কিংবা অনাত্মীয় পুরুষদের কাছে আসার সময় মুখ না ঢাকায় সেই নারীকে নবী তিরস্কার করছেন। এই বর্ণনায় আমরা এটাও দেখছি না যে, পুরুষরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না বলে, কিংবা তাঁর সৌন্দর্য পুরুষদের প্ররোচিত করতে পারে বলে তাকে ভবিষ্যতে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বরং উল্টোটাই ঘটেছে এখানে। রাসূল (সা) আল-ফাদ্‌লকে তাকিয়ে থাকা অবস্থায় দেখলেন এবং তার দৃষ্টি ঐ মহিলার দিক থেকে অন্যদিকে সরিয়ে দিলেন। আল-ফাদ্‌লকে তিনি এটাই শিক্ষা দিলেন সে যেন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। যে নারী তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তাকে ধমকালেন না বরঞ্চ তিনি আল-ফাদ্‌লের ঘাড়েই এই ঘটনার দায় দিলেন।

আল-ফাদ্‌লও নবীজির কাজের বিরোধিতা করেননি। আল-ফাদ্‌ল বলেননি যে, কিন্তু নবীজি, ঐ নারীই তো ফিতনা (প্ররোচনা)! বা হে আল্লাহর রাসূল, তাকে বলুন সে যেন নিজেকে ঢেকে রাখে ও আড়াল করে রাখে, যাতে অন্য পুরুষের দৃষ্টি কখনো তার উপর না পড়ে!

> আমাদের সমাজে পুরুষদের অধঃপতনের জন্য প্রায়ই নারীদের দিকে আঙুল তোলা হয়। নারীরা অন্য নারীদের অভিযোগ করে অশালীন পোশাক পরার দায়ে, অতিরিক্ত মেক-আপ করার জন্য কিংবা পুরুষদের সঙ্গে রসিয়ে কথা বলার জন্য। পুরুষরাও নারীদের ওপর একই ধরণের দোষ চাপায়। দোষটা সব সময় নারী হওয়ার ওপর এসেই দাঁড়ায়, আমরাই শেষ পর্যন্ত নারী-পুরুষ সম্পর্কের বোঝা হিসেবে হাজির হই। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সা) আমাদের কী শিখিয়েছেন?

নিশ্চয় আমাদের জন্য নির্দিষ্ট পোশাকের নীতিমালা ও মেলামেশার নীতিমালা রয়েছে, কিন্তু তা এখানেই শেষ নয়। উপরে আমরা যে নারীর ব্যাপারে কথা বললাম (আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন) তিনিও কিন্ত সুন্দরী ছিলেন। তা সত্ত্বেও রাসূল (সা) তাঁর সৌন্দর্যের নিন্দা করেননি। কিংবা তাঁকে প্রশ্ন করা, তাঁর সাথে কথা বলা থেকে বারণ করেননি। তাহলে আমাদের সমাজে কেন এমনটা করা হয়? আসুন শুধু নারীদের উপর দায় চাপানোর সংস্কৃতি থেকে আমরা বেরিয়ে আসি। সত্যিকার অর্থেই নবীর আদর্শ অনুসরণ করি, যেখানে প্রত্যেক নর-নারীই তার কাজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হবেএকে অপরকে দোষারোপ করবে না।

২. আমরা আরেকটি উদাহরণ দেখি। অন্য আরেক পুরুষ সাহাবি কেবল দেখেই ক্ষান্ত হননি। তিনি বরং এক নারীকে চুমু খেয়েছিলেন! নিচের বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারব আল্লাহ কীভাবে সেই ব্যক্তির আন্তরিক দোষ স্বীকার এবং রাসূল (সা) এর কাছ থেকে ক্ষমা ও দিকনির্দেশনা চাওয়ার ব্যাপারটিকে নির্দেশ করেছেন।

এক লোক এক নারীকে চুমু খেয়েছিল। তো সে পরে আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে তাঁকে ব্যাপারটা জানায়। এরপর আল্লাহ এই

আয়াত অবতীর্ণ করেন, নামাজ আদায় করো: দিনের দুই প্রান্তে আর রাতের কিছু সময়ে। ভালো কাজ নিঃসন্দেহে খারাপ কাজকে মুছে দেয়, [সূরা হুদ, ১১:১১৪] লোকটি আল্লাহর রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন এটা কি কেবল তার জন্য প্রযোজ্য? আল্লাহর রাসূল জবাবে বললেন, এটা আমার উম্মাহর সবার জন্যে প্রযোজ্য। [৪]

এই ঘটনা থেকে আমরা কী বুঝতে পারি? এই ঘটনা থেকে আমরা শিখি যে, আল্লাহ যিনি আমাদের স্রষ্টা, আমাদের প্রিয় পালনকর্তা আমাদের কাছে এটাই চান যে, আমরা যদি কোনো অপরাধ করেই বসি, তাহলে যেন সাথে সাথে তাঁর সঙ্গে আমরা সম্পর্ক জোরদার করি। তিনি একটি আয়াত পাঠিয়ে আমাদের এটাই বললেন যে, আমরা যদি কোন ভুল করে বসি তাহলে আমরা যেন তাঁর কাছে ফিরে যাই, আমাদের দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বজায় রাখি। দৈনন্দিন নামাজ সকল অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে আমাদের দূরে রাখে। [৫] আর এই সম্পর্ক ধরে রাখলে তা লাগাতার ক্ষমার পাথেয়ও হয়ে উঠবে। [৬]

তার মানে কিন্তু আমি এটা বলছি না যে, যারা অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত আছে, তারা দৈহিক মিলন করে সাথে সাথে নামাজ পড়ে নেবে। এরপর আবার পুরোনো পাপে ফিরে যাবে। ঐ সাহাবি রাসূল (সা)-এর কাছে অনেক পরিতাপ ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। রাসূল (সা)-এর কাছে নিজের দোষ স্বীকার করে তিনি সমাধান খুঁজছিলেন। তবে আমরা এখান থেকে যা বুঝতে পারি, তা হচ্ছে অনেক মহামানুষদেরও ভুল হয়। কখনো কখনো মানবিক প্রবৃত্তির কাছে তারা হেরে বসেন।

কিন্তু আমরা যখন তাদের কারও কারও মতো কোনো ভুল করে বসব, তখন পরিবর্তনের জন্য তারা যা করেছিলেন, আমাদেরও তা-ই করতে হবে। আমাদেরকে পরিতাপ করতে হবে। তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। পরে যেন আর কখনো এমন ভুলে না জড়াই সেজন্য দৃঢ়চিত্ত হতে হবে। আর যদি আবার ভুল করেই ফেলি তাহলে ক্ষমা চাওয়ার এই চক্র পুনরায় শুরু করতে হবে।

৩. কিন্তু কেউ যদি পুরোপুরি সীমালঙ্ঘন করতে চায় তার বেলায় কী হবে? সত্যি সত্যিই এমন কাজ করতে চেয়েছিলেন এমন একজনকে রাসূল (সা) কীভাবে বাধা দিয়েছিলেন? একবার এক যুবক রাসূল (সা)-এর কাছে এলেন এই অনুরোধ করতে যে, তাকে যেন বিবাহ বহির্ভূত দৈহিক মিলন করার অনুমতি দেওয়া হয়। আশেপাশের লোকেরা একথা শুনে বিষম খেলেন। যুবককে চুপ করাতে চাইলেন। রাসূল (সা) তাকে একাধারে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করলেন: তোমার মার সঙ্গে কেউ এমন করতে চাইলে তুমি কি এটা পছন্দ করতে? তিনি (সা) তাকে এরপর জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, তার মেয়ের সঙ্গে, তার বোনের সঙ্গে, তার কোনো মহিলা আত্মীয়ের সাথে এরূপ করা হলে কি সে তা পছন্দ করত? যুবকটি প্রতিটি প্রশ্নেরই নেতিবাচক উত্তর দিলেন। রাসূল (সা)-এর যুক্তির সামনে তিনি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আশ্বস্ত হলেন। অবশেষে রাসূল (সা) তার বরকতময় হাত যুবকটির উপর রাখলেন এবং আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, আল্লাহ, আপনি তার অপরাধ মার্জনা করে দিন, তার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দিন। এবং তাকে পবিত্র করে দিন। বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেই যুবক এই ঘটনার পর কখনো তিনি যা করতে অনুরোধ করেছিলেন তাতে জড়াননি। [৭]

যুবকটি রাসূল (সা)-এর যুক্তি সংস্পর্শ ও দুআ দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিকভাবে রহমতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। শারীরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে আমাদেরকেও রাসূল (সা)-এর মতো হতে শিখতে হবে। আমি অনেক মুসলিম নারীদের জানি যারা বিয়ে করতে প্রচণ্ড ভয় পান। কারণ, যৌনতার ব্যাপারটা তাদের বাবা-মারা এমন নিষিদ্ধ এক বিষয় বানিয়ে রেখেছেন যে, বিয়ের পর দৈহিক অন্তরঙ্গতার প্রতি তাদের মনে রয়েছে প্রচণ্ড ভয়।

আমি এমন অনেক তরুণ ছেলে ও মেয়েদের ব্যাপারেও জানি যারা বিয়ে করতে চায় কিন্তু তাদের বাবা-মা তাদেরকে বিয়ে দিতে আপত্তি জানায় শুধু একারণেই যে তাদের বংশ মেলে না। অবশেষে এসব ছেলে-মেয়েরা নিজেদের আর নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে বিয়ে-বহির্ভূত দৈহিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে।

অভিভাবক হিসেবে, যৌনতা ও শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারগুলো আলোচনার সময় আমাদেরকে রাসূল (সা)-এর কর্মপন্থা বিবেচনা করতে হবে। রাসূল (সা) জনসম্মুখে যুবকটির যৌনতা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করেছেন। একে কোনো নিষিদ্ধ বিষয় বানাননি। রাসূল (সা) যদি প্রকাশ্যে মানুষের সামনে এ ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন, তাহলে ঘরের নিভৃতে আপনার সন্তানদের সঙ্গে একাকী কেন আপনি এসব বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারবেন না?

তবে, তাই বলে ব্যাপারটাকে তাদের সামনে বিব্রতকরভাবে তুলে ধরারও প্রয়োজন নেই। তারা বড় হয়ে ওঠার আগেই তাদের সঙ্গে আন্তরিক ও উন্মুক্ত সম্পর্ক গড়ে তুলুন যাতে করে পরবর্তীকালে যখন এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন তখন ব্যাপারটা বিব্রতকর বা অস্বস্তিকর হবে না। যদি আপনাদের মধ্যে উন্মুক্ত সম্পর্ক থাকে তাহলে এ ধরনের আলোচনাও হবে গঠনমূলক,

ইনশা আল্লাহ।

উপরন্তু, সমাজের নেতা হিসেবে সমাজের সদস্যদের সঙ্গে এসব বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। যৌনতা এবং এ সম্পর্কিত বিষয়গুলো আলোচনার জন্য আমাদের পরিবারগুলোতে যদি প্রয়োজনীয় পরিবেশ না থাকে, তাহলে আমাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। সমাজের সঙ্গে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে যাতে করে আমরা সমাজের জন্য দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করতে পারি।

৩. আজকের দিনে যেমনটি ঘটে রাসূল (সা)-এর সময়েও বিবাহিত নারী-পুরুষ সাহাবিরা ব্যাভিচার করেছেন। ব্যাভিচার ইসলামে খুবই সাংঘাতিক এক ইস্যু। কারণ এটা পরিবারের অনুভূতিকে আঘাত করে। কিন্তু এ সংক্রান্ত যে ঘটনাগুলো বর্ণিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, রাসূল (সা) তড়িঘড়ি করে কাউকে শাস্তি দেননি। একবার এক নারী এসে তাঁকে বারবার বলছিলেন যে তাকে শাস্তি দেওয়া হোক, যাতে তিনি নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন। রাসূল (সা) তাকে অনেক সুযোগ দিচ্ছিলেন যাতে সেই নারী আর তাঁর কাছে শাস্তির অনুরোধ করতে না আসেন এবং কোনো শারীরিক শাস্তির মুখোমুখি না হন। শুধু তাওবা করেই যেন কাটিয়ে দেন। কিন্তু সেই নারী অন্য আর সকলের মতোই বারবার এসে শাস্তি মাথে পেতে নেওয়ার অনুরোধ করেছেন। আর ফলস্বরূপ তাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। [৮]

> এই ঘটনা উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এটাই দেখানো যে, রাসূল (সা)-এর সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে সেরা প্রজন্মের মধ্যেও এগুলোর অস্তিত্ব ছিল। তারাও ভুল করেছিলেন। কিন্তু তারপরও তারা ছিলেন প্রকৃত পুরুষ বা প্রকৃত নারী যাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার মতো সাহস ছিল। ছিল ভুল স্বীকার করার মানসিকতা। আর এধরনের ভুলত্রুটি হওয়ার পরও, এবং বিয়ে-বহির্ভূত দৈহিক মিলনের মতো কাহিনী হওয়ার পরও রাসূল (সা) নারী-পুরুষের একত্রে কাজ করার ক্ষেত্রকে নিষিদ্ধ করেননি। বরং তিনি তাদের শিখিয়েছেন কীভাবে পেশাদারিত্ব বজায় রেখে শ্রদ্ধার সঙ্গে তারা একসাথে কাজ করতে পারেন। আবার একইসাথে নারী-পুরুষের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ভগিনীত্বও বজায় থাকে।

নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেসব দৃষ্টান্ত আমি উল্লেখ করেছি, তার অধিকাংশতেই পুরুষদেরকে তাদের কামনাতাড়িত হয়ে কাজ করতে বা কাজ করতে চাওয়ার উল্লেখ থাকলেও নারীদের বেলায়ও একই কথা সত্য। নারীদের জৈবিক চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা ব্যাপারে যখন কথা বলা হয় তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীদেরকে এক্ষেত্রে সক্রিয় মনে করা হয় না। এই বাস্তবতা উপেক্ষা করা হয় যে, অনেক নারীদের মধ্যেও জৈবিক তাড়না শক্তভাবে কাজ করে। এবং এগুলোর সঙ্গে লড়াই করেই তাদের চলতে হয়।

রাসূল (সা)-এর সমাজে বসবাসরতদের যেসব ঘটনা আমরা উল্লেখ করেছি, আজকের দিনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই এ থেকে শিক্ষা নিতে পারেন। নিজেদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা, স্রষ্টার সঙ্গে ক্রমাগত সংযোগ এবং প্রবৃত্তি মোকাবিলা করার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে অথবা অনুশোচনা করে এবং পদস্খলন হলেই সাথে সাথে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার ধারণা বাস্তবায়ন করতে পারেন।

আমাদের আজকের সমাজে অনেকের মধ্যেই নারী-পুরুষ সম্পর্কের ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা নেই। কখনো কখনো নারীদেরকে মসজিদে এই ভয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না যে, তারা হয়তো পুরুষদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করবে। নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষদের বিচ্যুত হওয়ার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীদেরকে মূল কারণ হিসেবে দায়ী করা হয়। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, খুব কম সময়েই পুরুষদের এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়। নারীদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা কিংবা তারা যাতে পুরুষদের জন্য ফিতনা না হয়ে উঠে তা নিশ্চিত করার জন্য নারীদেরকে মসজিদের দেয়ালের বাইরে রাখা বাদ দিয়ে নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের যে দায়িত্ব আছে তা পালনের জন্য পুরুষদের খুব কমই বলা হয়। আমার মতে নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাসূল (সা)-এর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি আর যাই হোক কম্যুনিটির সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ ছিলো না।

আমাদের সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক কীভাবে মোকাবিলা করব সে জন্য কিছু সাধারণ পরামর্শ: [৯]

১. নিজের জন্য: আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, আমাদের নিজেদের ব্যাপারে, নিজেদের পোশাক ও কাজের ব্যাপারে আমরা নিজেরাই দায়ী। নারী-পুরুষ উভয়েরই রয়েছে মেলামেশা ও পোশাকের ব্যাপারে নির্দিষ্ট নীতিমালা। প্রত্যেককেই সেসব নির্দেশনা মেনে চলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। তবে কাউকে যদি এই নির্দেশনা মেনে চলতে সংগ্রাম করতে হয়, তাহলে সে জন্য কখনোই

অন্য কেউ তাকে দায়ী করতে পারেন না। কারও প্রতি যদি আপনার আকর্ষণ জাগে, তা সে যেভাবেই পোশাক পরুক না কেন, নারী কিংবা পুরুষ হিসেবে এটা আপনার নিজের দায়িত্ব: অন্যকে দোষ না দিয়ে চোখ সরিয়ে নেওয়া। আপনার কাজের হিসাব আপনাকেই দিতে হবে। যদি আপনি ভুল করেন, তাহলে সেজন্য আপনিই দায়ী।

২. পুরুষদের জন্য: আপনার পুরুষ হিসেবে যে সুবিধা আপনি পান তা এমনভাবে ব্যবহার করুন যাতে নারীরা এগিয়ে যেতে পারে, জ্ঞান অর্জন করতে পারে, দাওয়াহ দিতে পারে, মসজিদে উপস্থিত হতে পারে। নারীদের অস্তিত্ব কোনো সমস্যা নয়। আপনি যদি তাদের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ ও পেশাদার সম্পর্ক বজায় রাখতে না পারেন তাহলে এজন্য তাদের অস্তিত্বকে দায়ী করবেন না। নবীজির পদ্ধতি অনুসরণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন। নিজের কাজের জন্য নিজেকেই দায়ী করুন। ঠিক যেভাবে সাহাবিরা তাদের কৃতকর্মের দায়-দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আপনারা যেমন নারীদের “সঙ্গী” [১০] নারীরাও তেমনি আপনাদের সঙ্গী – এটি উপলব্ধ করুন।

৩. নারীদের জন্য: সাধারণভাবে সমাজ আমাদেরই দায়ী করে। আর তাই দায়িত্বের বোঝা আমাদেরই নিতে হবে। নারী হিসেবে দাবি করতে হবে আমাদের জন্য যাতে সেই জায়গা তৈরি করা হয় যাতে আমরা জ্ঞান অর্জন ও প্রসার করতে পারি। সমাজের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখতে পারি। অন্য কারও মানসিক ও মৌখিক আচরণ যেন আপনাকে মসজিদে উপস্থিত হতে কিংবা জ্ঞান অর্জনে বাধা না দেয়। প্রতিনিয়ত আমরা যেসব ঘটনার মুখোমুখি হই, সেগুলো মোকাবিলার জন্য আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে, জায়গা করে নিতে হবে। আল্লাহ চায় তো, এবং আমাদের পুরুষ সঙ্গীদের সাহায্যে আমরা দেখব নতুন দিগন্ত, যেখানে রাসূল (সা)-এর সমাজের মতো শ্রদ্ধাশীল সহাবস্থান ও ক্ষমতায়ন হবে ।

৪. তরুণদের জন্য: আমরা জানি আপনাদের অধিকাংশের হরমোন এখন উন্মত্ত। আর বাস্তবতা হচ্ছে আপনাদের ভুল ও কামনাকে মোকাবিলা করার জন্য আলাপ-আলোচনার যথেষ্ট খোলা পরিবেশও নেই। অভিভাবকদের সঙ্গে খোলামেলা কথা বলার পরিবেশ না থাকায় ভারসাম্য বজায় রাখা বেশ কঠিন। কাজেই আপনাদের সমাজ থেকে এমন কোনো মেনটরকে খুঁজে বের করুন যাঁর সঙ্গে আলাপ করতে পারবেন, সহায়তা পাবেন। আর আপনি যদি ভুল করেই থাকেন, তাহলে জেনে রাখুন তাওবার দরজা, আল্লাহর কাছে যাওয়ার দরজা সবসময় খোলা!

৫. অভিভাবক ও সমাজের নেতাদের জন্য: আমাদের কিশোর তরুণদের যাতে সুস্থ বিকাশ ঘটে সেজন্য আপনাদের প্রয়োজন। আপনাদের প্রজন্ম থেকে তাদের প্রজন্মে সফল পরিবর্তনের জন্য চাই উন্মুক্ত আলাপ। তাদেরকে সফল নারী-পুরুষ সম্পর্কের ব্যাপারে বাস্তব উদাহরণ দেখান। নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানোর পরামর্শ দিন। ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেওয়া এবং নারীদের ক্ষমতায়নে সাহায্য করার মাধ্যমে পুরুষরা কীভাবে নিজেদের ক্ষমতায়িত করতে পারে সে দিক-নির্দেশনা দিন। আপনাদের প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে নেতৃত্ব হস্তান্তরের জন্য এ বিষয়গুলো খুব জরুরী।

৬. সবার জন্য: আমরা সবাই ভুল করি, এমনকি সাহাবিরাও করেছেন! প্রতিটা ভুলকে যেন আল্লাহর কাছে যাওয়ার সুযোগে পরিবর্তন করতে পারি সেই চেষ্টা করুন। তিনি সবসময় আমাদের জন্য প্রস্তুত।

নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জন করে সাহাবিরা জন্মগ্রহণ করেননি। পেছনের ভুলত্রুটি নিয়েই তারা ইসলামে প্রবেশ করেছিলেন। সেগুলোর কিছু কিছু মুসলিম জীবনে তারা টেনেও এনেছিলেন।

নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে কুর’আনের একটি আয়াত গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি প্রস্তাব করে। তাদের প্রচেষ্টা দ্বারা সাহাবীরা এই আয়াতকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন। নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন দ্বিধা, সাংস্কৃতিক ভুল বোঝাবোঝি ও অনেক কাঠ-খোড় পোড়াতে হলেও আমাদেরকেও এক্ষেত্রে এই আয়াতটিই বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতে হবে।

“আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা’আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী।” [১১]

[১] ইব্‌ন মাজাহ, আবু দাউদ, তায়ালিসি, বায়হাকি, আহমাদ, তিরমিযি ও নাসা’ই। আল-আলবানি একে সহীহ বলেছেন (দেখুন সিলসিলাত আল-আহাদীস আল-সহীহ, ৩৪৭২)

[২] বর্ণনাটি পাওয়া যাবে সহীহ মুসলিমে

[৩] সহীহ বুখারি

[৪] সহীহ বুখারি

[৫] আল-কুর□আন ২৯:৪৫

[৬] □পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং এক জুমু□আহ থেকে আরেক জুমু□আহ এর মধ্যবর্তী সময়ে করা অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ; যদি না কোনো বড় অপরাধ (কবিরা গোনাহ) করা হয়ে থাকে।□ [সাহীহ বুখারি]

[৭] আল-হাকিম

[৮] সহীহ মুসলিম

[৯] আমার প্রিয় বন্ধু সানা ইকবাল থেকে অনুপ্রাণিত

[১০] রাসূল (সা)-এর শেষ খুতবা থেকে: □তোমাদের নারীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো, তাদের প্রতি সদয় হও, কারণ তারা তোমাদের সঙ্গী ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সহযোগী।□ [সহীহ বুখারি]

[১১] আল-কুর□আন ৯:৭১

সূত্রঃ VirtualMosque

মারিয়াম আমিরএব্রাহিমী